4 JUN 2017

যুগান্তর

ড. মো. তৌহিদুল ইসলাম

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রস্তাবিত মডেল

বাংলাদেশে একজন শিক্ষার্থীকে চারটি পাবলিক পরীক্ষা পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি এবং এইচএসসির গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে হয়। এ ধাপগুলোর সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে ব্যাপক ব্যবধান। কেবল জেএসসি এবং এসএসসি— এ দুটো ধাপে ব্যবধান তুলনামূলকভাবে কম। তাছাড়া প্রতিটি ধাপেই বহুমুখী বিষয় থাকার কারণে একজন শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। আর এইচএসসির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার ব্যবধান অকল্পনীয়। ফলশ্রুতিতে সর্বোচ্চ মেধাবীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও শুরুর দিকে বড় ধরনের ধাক্কা খায় এবং পরে অবশ্য ক্রমশ মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পড়াশোনাকে সহজতর করা এবং একইসঙ্গে শিক্ষার্থীকে নিজ নিজ বিষয়ে তাদের ভিত্তি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি মডেল তৈরি করা হয়েছে, যা এ প্রবন্ধে উপস্থাপন করা হল। প্রস্তাবিত এ মডেলে ৪টি পাবলিক পরীক্ষা থেকে দুটো পাবলিক পরীক্ষা বাদ দেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, আমি কি তাহলে আগের মতো কেবল এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাতেই ফিরে যাচ্ছি? না, তা নয়। আমার মডেলে পিএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা যুক্তিসহ বাতিলের প্রস্তাব রয়েছে।

একজন অভিভাবক হিসেবে আমি কোমলমতি ১০ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের জন্য পিএসসি পরীক্ষার ঘোরবিরোধী। পড়াশোনা শুরু করতে না করতেই এরকম ভয়াবহ একটি পাবলিক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হচ্ছে শিশুদের, যার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া বর্তমানে বাংলাদেশে পঞ্চম শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট দিয়ে কোনো চাকরিও হয় না। এটি শুধু ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তির যোগ্যতার মানদণ্ড। আমার মডেলে জেএসসি পরীক্ষা থাকবে এবং এটিই হবে জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষা। তবে ১৩টি বিষয় থেকে ৩টি বিষয় বাদ দিয়ে ১০টি বিষয় রাখা হয়েছে এভাবে : বাংলা ২০০, ইংরেজি ২০০, গণিত ১০০, বিজ্ঞান ১০০, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ১০০, কৃষি বিজ্ঞান (ছেলে শিক্ষার্থীদের জন্য)/গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য) ১০০, ধর্ম ১০০ এবং আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ ১০০সহ ১০০০ নম্বরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ড্রাইভার, পিয়ন কিংবা ক্লিনারের চাকরির জন্য ৮ম শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। ইতিপূর্বে ২য়/৩য় শ্রেণী পাস কিংবা একেবারেই পড়াশোনা না জানাও একজন চাকরি প্রার্থী নিজ গ্রামের স্কুল থেকে ৮ম শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট জোগাড় করতে পারত এবং মামা-চাচার জোরে সত্যিকার ৮ম শ্রেণী পাসকে পেছনে ফেলে চাকরিও পেয়ে যেত। জেএসসি চালু হওয়ায় অন্তত এ বিষয়টি ভালোভাবেই বন্ধ হয়েছে।

আমার মডেলের দ্বিতীয় পাবলিক পরীক্ষার নাম হল এসএসসি (সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট)। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত চার বছর পড়াশোনার পর একজন শিক্ষার্থী এ সার্টিফিকেট পাবে। নিম্নমান সহকারী, কম্পিউটার অপারেটর অর্থাৎ ৭ম জাতীয় স্কেলের ৩য় শ্রেণীভুক্ত ১৫ ও ১৬তম গ্রেডের কর্মচারী নিয়োগের যোগ্যতা হল দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনার প্রমাণসহ কম্পিউটারে অভিজ্ঞতা। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির যোগ্যতার মানদণ্ড দ্বাদশ শ্রেণী পাসের সার্টিফিকেট। তাই চলমান এসএসসি ও এইচএসসিকে একসঙ্গে করে ৪ বছরমেয়াদি প্রি-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স এসএসসি (সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) বা হাইস্কুল ডিপ্লোমা চালু করা যেতে পারে। ৪ বছর মেয়াদি এ কোর্সের প্রথম বর্ষ অর্থাৎ নবম শ্রেণীতে যে বিষয়গুলো পড়ানো হবে, তা হল— বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, গণিত ১০০, পদার্থবিজ্ঞান ১০০, রসায়ন ১০০, জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদবিজ্ঞান) ১০০ এবং আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ ১০০সহ মোট ৭০০ নম্বর। দশম শ্রেণীতে যে বিষয়গুলো পড়ানো হবে তা হল— বাংলা ১০০, ইংরেজি ১০০, গণিত ১০০, পদার্থবিজ্ঞান ১০০, রসায়ন ১০০, জীববিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান) ১০০ এবং আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ ১০০সহ মোট ৭০০ নম্বর।

আমার এ মডেলে সব বিভাগের নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা, ইংরেজি, গণিত এবং আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ— এ চারটি বিষয় বাধ্যতামূলক। বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের জন্য ৩টি করে বিষয় নিজ নিজ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা নির্ধারণ করবেন। আমার প্রস্তাবিত এ মডেলে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে বাংলা ও ইংরেজি বিষয় অন্তর্ভুক্ত নেই। কেননা দেখা গেছে, প্রচলিত এসএসসি ও এইচএসসিতে এ দুটো বিষয়ের সিলেবাসে ব্যাপক কোনো পার্থক্য নেই, বরং এসএসসির বাংলা ও ইংরেজির সিলেবাসই এইচএসসিতে ঘুরে-ফিরে আসে; আর সেজন্যই এ দুটো বিষয় দশম শ্রেণী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এ মডেলে একাদশ শ্রেণীতে যে বিষয়গুলো থাকবে তা হল— পদার্থবিজ্ঞান ২০০, রসায়ন ২০০, গণিত ২০০, জীববিজ্ঞান (উদ্ভিদবিজ্ঞান) ১০০ এবং আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ ১০০সহ মোট ৮০০ নম্বর। দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য ৮০০ নম্বরের বিষয়গুলো হবে পদার্থবিজ্ঞান ২০০, রসায়ন ২০০, গণিত ২০০ (গণিত-১০০ + পরিসংখ্যান ১০০), জীববিজ্ঞান (প্রাণিবিজ্ঞান) ১০০ এবং আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ ১০০। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সব বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আইসিটি/কম্পিউটার স্টাডিজ বাধ্যতামূলক। বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগের জন্য একই অনুপাতে নিজ নিজ বিভাগের বিশেষজ্ঞরা কোর্স নির্ধারণ করবেন। এ আলোচনা থেকে দেখা যায়, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৩০০০ নম্বরের কোর্স সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী এসএসসি (সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট) বা হাইস্কুল ডিপ্লোমাধারী হবে।

> বর্তমানে দশম শ্রেণীর ক্লাস শেষ হয় নভেম্বর-ডিসেম্বরে, এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারিতে, ফলাফল এপ্রিলে এবং কলেজে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হয় মে-জুন মাসে। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিলে, ফলাফল জুলাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হয় পরবর্তী জানুয়ারি নাগাদ। এভাবে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থীর জীবন থেকে অহেতুক একটি বছর চলে যায়। আমার প্রস্তাবিত মডেল অনুসরণ করা হলে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে অহেতুক এক বছর নষ্ট হবে না।

এ কোর্সের ক্লাস ও পরীক্ষা কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং কারা দায়িত্বে থাকবেন, তা উল্লেখ না করলে মডেলটি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। আমার এ মডেল অনুযায়ী জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস নিজ নিজ স্কুলে-কলেজে ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে। অক্টোবরে পরীক্ষা প্রস্তুতি, নভেম্বর হল পরীক্ষার মাস এবং ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ফলাফল প্রকাশ। অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বোর্ডের তত্ত্বাবধানে অল্টারনেট দিনগুলোয় একযোগে সবার পরীক্ষা শুরু হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১ নভেম্বর সকালে ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষা এবং বিকালে ৯ম শ্রেণীর পরীক্ষা থাকবে। তার পর দিন দশম ও একাদশ এবং পরবর্তী দিন দ্বাদশ ও ৮ম শ্রেণীর পরীক্ষা— এভাবে চক্রাকারে পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫০ বিষয়ের পরীক্ষার জন্য ২০ কার্যদিবস প্রয়োজন, যেখানে নভেম্বরে সাপ্তাহিক ২ করে ছুটি বাদ দিলেও ২২ কার্যদিবস পাওয়া যায়; যা পাঁচটি বর্ষের পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য যথেষ্ট। এক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ বছর মেয়াদি অনার্স কোর্সকে অনুসরণ করা যেতে পারে। নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা কেবল নম্বরপত্র পাবে। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার পর ৪ বছরের গড় করে জিপিএ নির্ধারিত হবে এবং সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রদান করা হবে। জেএসসি পাসের পরপরই কলেজগুলো নবম শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। যারা কলেজে ভর্তির সুযোগ পাবে না, তারা নিজ নিজ স্কুলেই দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এসএসসি (মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট) লেভেল না থাকলে কাদের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করানো হবে? চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাতে এইচএসসির কোর্সগুলো রয়েছে। যদি এইচএসসির কোর্সগুলো বাদ দেয়া হয়, তাহলে দুই থেকে আড়াই বছরে ডিপ্লোমা শেষ হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অস্ট্রেলিয়াতে দ্বাদশ শ্রেণীর পর ২ বছর ডিপ্লোমা পড়তে হয়। এসএসসি (সিনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট)-এর পর যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে/অনার্সে ভর্তির সুযোগ পাবে না, তাদের মধ্য থেকে আগ্রহীরাই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হবে। আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য কোন সিলেবাস অনুসরণ করা হবে? এর সমাধানও রয়েছে এ মডেলে, আর তা হল— বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পূর্ববর্তী দু'বছর অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর সিলেবাসের ওপরই ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণীত হবে।

আমার প্রস্তাবিত মডেলের সুবিধা কী অথবা কেনইবা এ মডেল বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা থেকে উন্নত, এরকম নানাবিধ আলোচনা-পর্যালোচনা হতেই পারে। প্রস্তাবিত এ মডেলের সুবিধা অনেক; তবে আপাতত ৪টি সুবিধার কথা এখানে উল্লেখ করা হল। প্রথমত, মডেলটি কোর্সভিত্তিক হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অহেতুক হয়রানি যেমন এসএসসি পরীক্ষায় আবারও নবম শ্রেণীর পড়াশোনা এবং এইচএসসিতে একাদশ শ্রেণীর পড়াশোনা থেকে মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়ত, একজন শিক্ষার্থী নিজ নিজ বিষয়ের গভীরে যেতে পারবে, যা তার উচ্চশিক্ষা স্তরের পড়াশোনা সহজ করে তুলবে। তৃতীয়ত, বর্তমানে দশম শ্রেণীর ক্লাস শেষ হয় নভেম্বর-ডিসেম্বরে, এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ফেব্রুয়ারিতে, ফলাফল এপ্রিলে এবং কলেজে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হয় মে-জুন মাসে। একইভাবে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এপ্রিলে, ফলাফল জুলাই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হয় পরবর্তী জানুয়ারি নাগাদ। এভাবে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থীর জীবন থেকে অহেতুক একটি বছর চলে যায়। আমার প্রস্তাবিত মডেল অনুসরণ করা হলে শিক্ষার্থীদের জীবন থেকে অহেতুক এক বছর নষ্ট হবে না। চতুর্থত, যারা ডিপ্লোমা পড়ে, তাদের এসএসসি পাসের পরপরই ভর্তি হতে হয়। শিক্ষার্থীদের অনেককেই আফসোস করতে দেখা যায়— এইচএসসি পাস করলে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেত। আমার প্রস্তাবিত মডেল কার্যকর হলে সব শিক্ষার্থী প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে/অনার্সে ভর্তির চেষ্টা করতে পারবে, ব্যর্থ হলে ডিপ্লোমায় ভর্তি হবে এবং এতে কারও কোনো আফসোস থাকবে না। পরিশেষে আমার প্রস্তাবতি মডেলটি যদি যুক্তিযুক্ত মনে হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় সংশোধন সাপেক্ষে এটিকে এদেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজন করা যেতে পারে।

ড. মো. তৌহিদুল ইসলাম : *সহকারী অধ্যাপক (কৃষি), সার্ড, বাউবি এবং ইউজিসি পোস্ট ডক্টরাল ফেলো, বায়োটেকনোলজি বিভাগ, বশেমুরকৃবি*

প্রধান নির্বাহীর কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর